অষ্টাদশ শতাব্দীর সামগ্রিক সংকটের সামনে বাংলাদেশের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তার নিজ রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। পুরাতন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তঃপুরের শিক্ষার কী স্থান ছিল এবং পুরাঙ্গনারা প্রকাশ্যভাবে কতটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন তা আজ জানা এক দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। গবেষকরা লক্ষ করেছেন যে উচ্চবর্গের কিছু মহিলা প্রথাগত শিক্ষা লাভ করলেও সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তা বিশেষ রেখা পাত করে না। কুশিক্ষা এবং অশিক্ষাই ছিল অধিকাংশ মহিলার বিধির বিধান। খুব সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া সম্পত্তির অধিকার, নিজেদের শরীর ও মনের উপর অধিকার সমেত অধিকাংশ মৌলিক অধিকার থেকে নারী ছিল বঞ্চিত। সামাজিক নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকার জন্যে সমস্ত রকম সামাজিক নিপীড়ন নারীকেই সহ্য করতে হত। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্য ছাড়াও পুরুষ ও নারীর শ্রেণী বৈষম্য বোধ হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে পাশাপাশি অবস্থান করত।

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে তথা বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর

Scanned with CamScanner

অচলায়তনে শাসক হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম আঘাত করে। ভারতবর্ষ নয় শুধুমাত্র বাংলা সুবা এককভাবে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্মচারীর সাহায্যে শাসন সম্ভব নয় তা দেওয়ানি কার্যকর করার সময় তারা উপলব্ধি করে। ফলশ্রুতি হিসাবে আসে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" যার মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের একদল ভারতীয় সমর্থক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের ফলে শাসকবর্গের আরও বৃহৎ ও ব্যাপক জনসমর্থনের প্রয়োজন হয়, তাদের দরকার হয় শাসিতের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন করা। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা। এই পটভূমির সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক শক্তিগুলির চাপ যুক্ত হবার ফলেই বোধ হয় ১৮১৩ সালে কোম্পানি তাদের পূর্বতন নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করে। দেশীয় জনগণের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে এই টাকা কাদের জন্য খরচ করা হবে এই প্রশ্নের উত্তরে কর্তৃপক্ষ স্ত্রী / পুরুষের সমতার কথা বিবেচনা করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার সমান সুযোগ পাবার অধিকারের দাবি ছিল অকল্পনীয়, কিন্তু সামান্যতম কোনও সুযোগের কথাও বিবেচনা করা হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল (ক) কলকাতা মাদ্রাসা, (খ) সংস্কৃত কলেজ। রক্ষণশীল এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিল। লর্ড মিন্টো ভারতীয় সমাজে বিদ্যাচর্চার অভাব লক্ষ করে চারটি প্রাচ্য বিদ্যার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮১৫ সালে লর্ড হেস্টিংস ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, কিন্তু কোনও বিদেশীয় শাসককেই প্রাক-কোম্পানি যুগের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ধার করার কথা শোনা যায় না। রেভারেন্ড উইলিয়াম অ্যাডামের বিখ্যাত রিপোর্টে ভারতের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এক করুণ চালচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। রাজশাহী জেলার বিবরণ দেবার সময় স্ত্রী শিক্ষা বা অশিক্ষার এক ভয়াবহ চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। রানি ভবানীর মতো বিচক্ষণ মহিলার নেতৃত্বে অঞ্চলটির দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়সের সমস্ত মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, এমনকী তাদের শিক্ষা দেবার কথা অভিভাবকরা বিবেচনাও করেন না। তাদের আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যাডামস ধর্মীয় প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা নারীর জীবনে বৈধব্যের অভিশাপ ডেকে আনবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হত।

Scanned with CamScanner

১৮৩৪ সালে মেকলের ভারতে আগমন এবং আইনসভার সদস্য পদে যোগদানের ঘটনাকে ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়। মেকলের উপর গভীর আস্থা থাকার কারণে বড়লাট বেন্টিং তাকে জি.সি.পি.আই. বা জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস-এর প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করেন। মেকলের বিখ্যাত প্রস্তাব ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শিক্ষা রূপ কী হবে সে সম্বন্ধে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান করে। এই ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি যে অ্যাডামের বিখ্যাত রিপোর্ট সামনে থাকা সত্ত্বেও মেকলের প্রস্তাবে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত সামান্যতম কোনও বিবৃতি নেই। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করার পর রাশিয়া যেভাবে আদিম পর্যায় থেকে উন্নতি লাভ করেছে, মেকলে আশা প্রকাশ করেছিলেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কিছু ঘটবে। কিন্তু তথাকথিত এই আদিমসমাজের তলার দিকে যাদের অবস্থান তাদের কীভাবে তুলে আনা হবে সে সম্বন্ধে মেকলে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। শাসক হিসাবে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি কোম্পানির এই নির্লিপ্ত নির্বিকার মনোভাব প্রায় এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিরোধের পর্যায়ে পড়ে। একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে কোম্পানির প্রতিরোধকে বোঝা সম্ভব। ১৮৪৫ সালে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এবং রামকৃষ্ণ মুখার্জী স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল অব এডুকেশনের কাছে একটি মহিলা বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করেন। বিদ্যালয়টির অর্ধেক আর্থিক দায়িত্ব তারা এবং অপর অর্ধেক দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করার জন্য তারা সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ করেন। জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নেতৃত্বে সভার কাজ শুরু হয়। বেথুন প্রস্তাবটির সারবত্তা বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্যে কাউন্সিলকে অনুরোধ করেন। বেথুনের উপস্থিতি সত্ত্বেও কাউন্সিলের অপরাপর সদস্যেরা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হল না, আর্থিক সংকটের যুক্তিতে প্রস্তাবটি নাকচ করা হল। এর পরবর্তীকালে বেথুন দেশীয় মহিলাদের উন্নতিকল্পে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নেন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে দেশীয় ভদ্রলোকদের সহায়তায় বিদ্যালয়টি শুরু করতে এগিয় যান। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে ২১টি ছাত্রী নিয়ে বেথুন প্রতিষ্ঠিত "কলকাতা মহিলা বিদ্যালয়" তার যাত্রা শুরু করে। বেথুনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পনেরা দিন পরে রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারে নিজ বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর সুখসাগর, উত্তরপাড়া বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয়

Scanned with CamScanner

খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কলিকাতা মহিলা বিদ্যালয়ের অনুকরণে বারাসতেও মহিলা বিদ্যালয়টি পুনর্গঠন করা হয়। কিন্তু এই সব বিদ্যালয়ের কোনোটিই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কারণ স্থানীয় জনগণের বিরোধিতা এবং সরকারি নিষ্ক্রিয়তা। লর্ড ডালহৌসির কাছে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিতে বেথুন এই সব বিদ্যালয়ের প্রতি প্রাদেশিক সরকার যেন মনোযোগ দেন এই মর্মে একটি অনুরোধ করেন। ১৮৫০ সালের ১১ এপ্রিল সরকারি আদেশনামা জারি হয়। ১৮৫১ সালের ১২ অগস্ট বেথুনের অকাল প্রয়াণের পর ডালহৌসির উদ্যোগে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ বিদ্যালয়টিকে অধিগ্রহণ করে, বেথুনের নামাঙ্কিত এই বিদ্যালয়টি সরকারি পরিচালনায় প্রথম মহিলা শিক্ষায়তন।

ইতিমধ্যে পুরুষদের শিক্ষা বিপুল পরিমাণ অগ্রগতি লাভ করেছে। হিন্দু কলেজ, যেখানে মেয়েদের এবং নিম্ন বর্ণের পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না, একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হল, এরও পূর্বে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। ১৮২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এগ্রিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া', ১৮৩৯ সালে ইংল্যান্ডের অনুকরণে কলকাতায় মেকানিকস ইনসটিটিউট স্থাপন করা হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে এই সমস্ত শিক্ষায়তনের দ্বার ভারতীয়দের জন্য খুলে দেওয়া হয়। কিছু শিক্ষিত ভারতীয় যুবক যেমন রাধানাথ শিকদার, তারাদাস চক্রবর্তী প্রমুখ এই সব প্রতিষ্ঠানে বিদ্যা চর্চার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সীমিত অর্থে হলেও পুরুষেরা বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার জগতে প্রবেশ করতে পেরেছিল। কিন্তু সেখানে মেয়েদের অতি সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার ধারণার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারতীয় স্ত্রী ও পুরুষদের প্রতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বৈষম্যমূলক নীতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? এটি কি শুধুমাত্র দেশীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ না করার নীতি? ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ কী হবে সে সম্বন্ধে তারা তখনও সুনিশ্চিত নন। স্ত্রী সমাজকে শুধুমাত্র আদর্শগত কারণে শিক্ষার পরিধিতে নিয়ে এলে দেশীয় জনগণের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা অনুমান করতে পারেননি বলেই বোধ হয় সমস্যাটিকে এড়িয়ে গেছেন। প্রমাণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এলফিনস্টোনের মতো ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রশাসকও সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রস্তাবে খুব উৎসাহ প্রকাশ করেননি। সরকার দেশীয়

Scanned with CamScanner

জনজাগরণের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে জনজাগরণের স্পন্দন সমাজজীবনে অনুভব করা যায় এবং এর প্রভাবেই কি স্ত্রীশিক্ষায় বেশ কিছু অগ্রগতি লক্ষ করা যায়?

দ্বিতীয়ত একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। প্রশাসনের সমস্ত পদে ইংরেজদের দিয়ে পূর্ণ করলে যে আর্থিক ভার বহন করতে হবে তার জন্যে কোম্পানি সরকার একেবারেই প্রস্তুত নন, প্রশাসনের তলার দিকে কম দায়িত্বশীল পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা যেতে পারে। কম বেতনের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা এরা পূরণ করবে। বিদ্যার সঙ্গে বিত্ত উপার্জনের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। একই শিক্ষা মেয়েদের দিলে মেয়েরাও অনুরূপ কাজ করতে সক্ষম হত, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনও সমাজব্যবস্থাই মেয়েদের এই প্রগতিশীল ভূমিকায় দেখতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং একটি সাধারণ শিক্ষাই ছিল মেয়েদের জন্যে যথেষ্ট। সমাজের একটি অংশকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে অপর আর একটি অংশকে অশিক্ষার অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোনও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে তৃতীয় একটি দৃষ্টিকোণও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোনও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। অর্থনৈতিক বিস্তারের জন্যেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানিকে রাজনৈতিক সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। অনেক পথ অতিক্রম করে কোম্পানি অবশেষে নিজেকে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৮১৩ সালে সরকারি আদেশ বলে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং ভারতের ক্ষেত্রে "অবাধবাণিজ্যের" নীতি অনুসৃত হয়। ১৮১৩ সালে কোম্পানি সনদ নবীকরণ করার সময় ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় পণ্যের পরিবর্তে কীভাবে ব্রিটিশ পণ্য প্রচলন করা সম্ভব? কীভাবে ব্রিটিশ পণ্যকে ভারতীয় পণ্যের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করানো যাবে? এই পরিকল্পনায় প্রথম অসুবিধা ছিল ভারতীয়দের দারিদ্র। হেস্টিংস, জন ম্যালকম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন ভারতীয়দের ব্রিটিশ পণ্য কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য পাওয়া যায় স্যার টমাস মানরোর কাছ থেকে। তিনি

Scanned with CamScanner

সুস্পষ্টভাবে বললেন ভারতীয়রা তাদের তৈরী মোটা পশম বস্ত্র ব্যবহার করতে পছন্দ করে সুতরাং ইংল্যান্ডের পশম বস্ত্র ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলন করা সম্ভব নয়। কমিটি মানরোকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ভারতীয় স্ত্রীলোকদের প্রসঙ্গটি আনেন। অর্থাৎ পরিবারের ব্যবহার্য দ্রব্যের বিকল্প নির্বাচনে স্ত্রীলোকদের কোনও বক্তব্য থাকতে পারে কিনা মানরোকে জিজ্ঞাসা করা হল : "হিন্দু স্ত্রীলোকেরা কি তাদের স্বামীর ক্রীত দাস নয়?" অর্থাৎ তাদের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই। মানরো তীব্রভাবে এ বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্যের অবাধ প্রবেশের ফলে প্রাচীন ভারতীয় হস্তশিল্পের বিনাশ ঘটে। আর্থিক ও অন্যান্যভাবে ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে উন্নত ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। ভারতের আর্থিক দুরবস্থায় ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ব্রিটেনের পূর্ব যুগের শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। অজ্ঞ অশিক্ষিত ধর্মান্ধ ভারতীয়দের সংস্কার ছাড়া পরিবর্তনের কোনও আশা নেই। সংস্কারমূলক কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা সংস্কার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানদীপ্ত নাগরিক তৈরি করার প্রস্তাব দিলেন। মেকলে আরও বাস্তবায়িত পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার প্রসারের কথা ভেবেছিলেন। ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত হলে ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে এবং তারা তখন ব্রিটিশ পণ্যের জন্যে চাহিদা বোধ করবে। ইংরেজ সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা ইংরেজ জীবনযাত্রাকে অনুসরণ করবে এবং সেই পথেই প্রবেশ করবে ব্রিটিশ পণ্য। চার্লস ট্রেভেলিয়নও অনুরূপভাবে শিক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে বিশাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করেছিলেন। শিক্ষার প্রসার ঘটলে সুনিশ্চিতভাবে ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

শিক্ষাকে এক সীমিত অর্থে চিন্তা করার ফলে অন্তঃপুরবাসী স্ত্রী লোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের কথা তারা ভাবেননি, ভারতীয় নারীকে ব্রিটিশ পণ্যের উপভোক্তা করবার জন্যে উপযুক্তভাবে তৈরি করতে হলে প্রথমেই তাকে নিজ সমাজের প্রতিরোধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার প্রয়োজন ছিল। ট্রেভেলিয়ান প্রমুখ আদর্শবাদী প্রশাসকদের আশা ছিল যে ইংরাজি শিক্ষা ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে হিন্দু ধর্মের স্বাভাবিক পতন ঘটবে। ১৮৩৬ সালে মেকলে তার বাবাকে চিঠি লিখছেন যে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার ঘটলে আজ থেকে ত্রিশ বছর পরে

Scanned with CamScanner

ভারতবর্ষে কোনও মূর্তি পূজার উপাসনা থাকবে না। এর জন্য ভারতীয়দের ধর্মান্তকরণের কোনও প্রয়োজন হবে না; জ্ঞান এবং যুক্তিবাদের স্বাভাবিক প্রসার ঘটার ফলে ভারতীয়রা ধর্মীয় কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ সমাজের গভীরে প্রবেশ করলে সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তনে নাড়া পড়ত সন্দেহ নেই; তখনই বোধ হয় নারী সম্প্রদায় শিক্ষা ও মুক্তির আশা করতে পারত। মেকলের এ আশা ফলবতী হয়নি। পরবর্তীকালের সিপাহী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য গণবিদ্রোহ মেকলের চিন্তাকে ব্যর্থ প্রমাণিত করেছিল।

আদর্শবাদী গোষ্ঠীর বিপরীতে অবস্থান করছিলেন অপর একদল বাস্তববাদী সন্দেহপরায়ণ প্রশাসক গোষ্ঠী, যারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই শিক্ষা দেবার বিরোধী, লর্ড এলেনবরাকে এদের প্রতিনিধিমূলক চরিত্র বলে গণ্য করা যেতে পারে। শিক্ষার দ্বারা কোনওরকম সামাজিক পরিবর্তনের তিনি বিরোধিতা করেছেন। জনকল্যাণমূলক কাজের দ্বারা পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধিকেই তিনি ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য বলে মনে করতেন। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা দান তার মতে "বিপজ্জনক", কারণ "কোনও চিন্তাশীল জনগণ আমাদের শাসন ব্যবস্থা মেনে নেবে না"। শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চস্তরে সব সময় ব্রিটিশ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এই ধরনের প্রশাসকেরা স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারকে কোনও মতেই উৎসাহ দেবেন না তাতে আর সন্দেহ নেই।

স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অবহেলা অপর আর একটি কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সমসাময়িক ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্ত্রী শিক্ষা ছিল অপ্রতুল। সমাজের দরিদ্রশ্রেণীতে স্ত্রী সম্প্রদায় প্রায়ই সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত; এমনকী ধনী গৃহেও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম শিক্ষা দেওয়া হত। ধনী কন্যাদের বোর্ডিং স্কুলের ব্যবস্থা ছিল বটে কিন্তু তাদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। বাড়ির বয়স্কা সদস্যদের কাছ থেকে মেয়েরা লেখা পড়া, সেলাই, গার্হস্থ্য বিদ্যা শিক্ষা লাভ করত। ধ্রুপদী বিদ্যার চর্চা করতে পারতেন এরকম মহিলা ছিলেন দুর্লভ। অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে দেওয়ার যুক্তি হিসাবে বলা হত শিক্ষিত স্ত্রী স্বামীর অনুগত হবে না। ভিক্টোরীয় যুগেও অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি ঘটেনি। ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন "ভাইদের মহার্ঘ শিক্ষা দেবার জন্যে বোনদের আত্মত্যাগ করতে হত।" ইংল্যান্ড নিজ রাষ্ট্রের স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির জন্যে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা

Scanned with CamScanner

নেয়নি। সেখানে আমরা কী করে আশা করতে পারি সে তার উপনিবেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্যে উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করবে?

Scanned with CamScanner